শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: যোগাযোগ

প্রকাশ কাল: মার্চ ২০১১

Sense International (India) প্রকাশিত "Handbook on Deafblindness" থেকে সংকলিত।

বাংলা রূপান্তর ও অনুবাদ: খসরু মইন তানবির আহমেদ

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ: লেফটেন্যান্ট (অবঃ) এম. আজিজুর রহমান

কম্পিউটার ইলাস্ট্রেশন: মোঃ শারাফাত আলী

সম্পাদনায়: সাদাফ নূরী চৌধুরী

প্রকাশনায়:

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস

বাড়ী নং-সি/৮৮, রোড নং-১৩/এ, ্বনানী, ঢাকা।

অর্থায়ন ও সহযোগিতায়:

UK Aid

Sense International

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কার্যক্রম অতি সম্প্রতি বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। বলতে গেলে ২০০৭ সালের আগে এ নিয়ে উল্লেখ করার মত তেমন কোন উদ্যোগ এদেশে নেয়া হয়নি। একটি মানুষ, যে দেখতে পায় না, একই সাথে শুনতে পায় না এবং কথা বলতে পারে না, এরাই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে, অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণীত হয়েছে, জাতীয় নীতিমালা রয়েছে, সরকারী কর্মসূচী রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে উল্লেখ করার মত উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে এসব কিছুতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করার প্রধান অন্তরায় তাদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন। প্রচলিত প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে কোন না কোন যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়া আজ প্রতিষ্ঠিত যেমন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ইশারা ভাষা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্রেইল পদ্ধতি ইত্যাদি শ্রবণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের জন্যও স্পর্শ বা টেকটাইল পদ্ধতি রয়েছে তবে আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই। ইতিমধ্যে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের এ প্রক্রিয়াসহ নানাবিধ প্রক্রিয়া তৈরী ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যা অনুসরণে এদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সিডিডি প্রকাশিত এই ধারণা পত্রটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে অধিকতর সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ২০০৮ সালে **UK Aid** এর অর্থায়নে ও **Sense International** এর সার্বিক সহায়তায় বাংলাদেশে ৬টি সহযোগী সংগঠনের মিলিত প্রচেষ্টায় ৬টি জেলায় স্বল্প পরিসরে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় এযাবৎ দুই শতাধিক শ্রবণদৃষ্টি মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং সম্প্রতি আরও নতুন ১০টি সহযোগী সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করে এ সংখ্যাকে ৮০০ জনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে সিডিডি ঢাকা শহরে **"National Resource Centre on Deafblindness"** নামে একটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই কেন্দ্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ২ বছর সময়কালে সিডিডি ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ১৫ জন

কর্মীকে **Sense International** এর সহায়তায় ভারতে ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। এই **National Resource Centre on Deafblindness** থেকে এযাবত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ তৈরী ও বিতরণ করেছে এবং ক্রমাগতভাবে এর উন্নয়ন কাজ চলছে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিখন উপকরণ তৈরী প্রক্রিয়ায় সিডিডি এবারে প্রকাশ করছে **Sense International** প্রকাশিত **"Handbook on Deafblindness"** এর বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর। বইটির নাম দেয়া হয়েছে "শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: তথ্য সম্ভার"। যারা প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে কাজ করেন তারা প্রতিবন্ধী জনগণেরই একটি অংশ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হবেন বলে আমাদের ধারণা। সর্বোপরি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের জন্য এই বইটি তাদের পরিবারের শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষটির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশাকরি।

সিডিডি কর্তৃক পরিচালিত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সকল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য **Sense International India** এবং এর সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দূরূহ কাজগুলো সম্পদনে আর্থিক সহায়তার জন্য টক অরফ এর প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সাদাফ নূরী চৌধুরী
ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার
ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস, সিডিডি

এ.এইচ.এম. নোমান খান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: যোগাযোগ

যোগাযোগ

যোগাযোগ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন। এটি মানুষসহ যে কোন প্রাণীর জন্যই অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়। প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজনে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি পন্থা বা উপায় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের অনুভূতি, চাহিদা, আকাঙ্খা অন্যের কাছে প্রকাশ করি। আমরা আমাদের বার্তা বা গবংংধমবং আদান প্রদানের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকি। যোগাযোগের জন্য মৌখিক ভাষাই ব্যবহার করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য, তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আমরা ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করতে পারি। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা একে অপরের অনুভূতি, চাহিদা অনুধাবন করতে পারি। এর মাধ্যমে আমাদের পরিপার্শ্বের সাথে অর্থপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠে।

যোগাযোগের ধারণা একটি বিস্তৃত বিষয়। এটি শুধুমাত্র লিখিত বা মৌখিক ভাষার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সচেতন অবস্থায় আমরা আমাদের পরিপার্শ্বের সাথে বিভিন্ন ভাবে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকি। আমাদেরকে ঘিরে যা কিছু আছে, যেমন- খাবারের ঘ্রাণ, কাপড়ের ছোঁয়া, কল থেকে পানি পড়ার শব্দ, চোখের নড়াচড়া সব কিছুকেই আমরা যোগাযোগের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য শারীরিক অভিব্যক্তি, ছবি, কারো কাছে বা দুরে যাওয়া, কথা, লেখাকে ব্যবহার কর হয়। ম্যাকিনস এন্ড টেফরি (১৯৯৭) এর মতো আমরা যা প্রকাশ করতে চাই তার পরিপূর্ণ রূপই হচ্ছে যোগাযোগ। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রবণ ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়। ফলে সে যা শোনে খুব তাড়াতাড়িই তা আত্মস্থ করে। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ভাষা ব্যাতিত যোগাযোগের অন্যান্য যেসকল মাধ্যম রয়েছে- চোখের অভিব্যক্তি, অন্যের মনোভাব, আচরণ, শারীরিক অভিব্যক্তি অনুধাবন করতে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে আমরা যত ভাবে যোগাযোগ করি তার বেশিরভাগই সম্পন্ন হয় কথ্য ভাষা ব্যতিত অন্যান্য পন্থায়। আর এখানেই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা এই অভাষাগত মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। একই সাথে কথার মাধ্যমে যোগাযোগও খুব সীমিত হয়ে থাকে।

যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?

যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি, অভিব্যক্তি, তথ্য ও বার্তা অন্য একজন ব্যক্তির নিকট সঞ্চারিত করে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন উপায় বা পন্থা রয়েছে। এসকল পন্থা প্রচলিত উপায়ের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর হয়ে থাকে।

গ্লিন ও স্মিথ (**Glenn and Smith,** ১৯৯৮) এর মতে 'যোগাযোগ হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তা-ধারণা, সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা, আকাঙ্খা, চাহিদা ইত্যাদি কথায়, লেখায়, ইশারায়, শারীরিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে অন্যের কাছে প্রকাশ করে।'

সান্ডারল্যান্ড বলেন (**Sunderland,** ২০০৪) 'ভাষা, কথা বলা ও শোনা এই তিনটি বিষয় যোগাযোগের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে। কোন কারণে যদি কারো এই তিনটি বিষয়ের কোনটির বা তিনটিরই সমস্যা থেকে থাকে তবে তার যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।

যোগাযোগের উপায়:

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে, অন্যকে বোঝাতে আমরা বিভিন্ন পন্থা বা মাধ্যম ব্যবহার করে থাকি। একইভাবে একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এখানে যোগাযোগের এমনই কিছু মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইশারা ভাষা: যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইশারা ভাষা। এক্ষেত্রে ইশারার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তা, ধারণা প্রকাশ করি। হাতের নির্দিষ্ট আকৃতি ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ইশারা ভাষা তৈরি হয়েছে। দৃশ্যমান ইশারার ক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃষ্টি সীমার মধ্যে এই ইশারা সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে ইশারার ক্ষেত্রে তার অবস্থান, দূরত্ব, দৃষ্টিসীমা, আলোর মাত্রা এবং বিষয়কে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আবার স্পর্শের মাধ্যমে ইশারার ক্ষেত্রে যে ইশারা করছে তার হাতে যিনি ইশারা গ্রহণ করছেন তার হাতে ধরা থাকবে। যিনি সম্পূর্ণ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথবা খুবই অল্প মাত্রার দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন তার ক্ষেত্রে স্পর্শের মাধ্যমে ইশারা উপযোগী।

উন্মুক্ত হাতের মাধ্যমে ইশারা ও স্পর্শের মাধ্যমে ইশারা (Hands-on singing, tactile sign language): এই ইশারা স্পর্শের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এর মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার হাত যার সাথে সে যোগাযোগ করবে তার হাতের উপরে রাখবে। এর ফলে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার হাতের আকার-আকৃতি, অবস্থান ও নাড়াচড়া অনুভব করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে কি বলা হচ্ছে উভয়ই তা অনুধাবন করবে।

চোখের সামনে বা দৃষ্টিসীমার মধ্যে ইশারা, স্পর্শের মাধ্যমে ইশারা (Visual frame singing, tactile sign language): যে সকল শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের টানেল ভিশন (ব্যক্তি একটি সরলরেখা বরাবর দেখে, এই রেখার বাইরে আশেপাশের কোন কিছু সে দেখতে পায়না। ফলে দৃষ্টিশক্তি সংকুচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে দেখতে পায়) রয়েছে তারা যোগাযোগের জন্য এই ইশারা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এই ইশারা প্রচলিত ইশারা ভাষার মতোই। তবে ইশারা তৈরির জন্য যে হাত ব্যবহার করা হয় সে হাত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের মুখের সামনে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে।

হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে শব্দ বানান করা (Finger spelling): শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে শব্দ বানান করা। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সহজেই এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। আমেরিকান ইংরেজী বর্ণমালা এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বর্ণমালায় প্রতিটি অক্ষরের জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক রয়েছে, যা হাতের বিভিন্ন আকৃতির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে থাকে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ এই ইশারা হাতের তালুতে অনুভব করে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে। এই পদ্ধতি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কার্যকর ও উপযোগী।

হাতের তালুতে লেখা (Print on plam): এই পদ্ধতিতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতের তালুতে একটির পর একটি অক্ষর লিখে বাক্য গঠন করা হয়। প্রতিটি অক্ষরই বড় হাতের হয়ে থাকে। এ থেকে সে অনুধাবন করতে পারে কি বলা হচ্ছে। অক্ষর লেখার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, অক্ষরগুলো যতটা সম্ভব সহজ, সরল করে লিখতে হবে। প্যাচানো বা জটিলতা পরিহার করা আবশ্যক।

কথা বলা: যে সকল শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর কিছুটা হলেও শ্রবণ ক্ষমতা রয়েছে তারা কথা, বিভিন্ন শব্দ শুনতে পায়। কোন কোন মানুষের তীব্রমাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই কথা, শব্দ পরিস্কারভাবে অনুধাবন করতে পারে, বুঝতে পারে।

লিপ রিডিং: যেসকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বল্পমাত্রার হলেও দৃষ্টি ক্ষমতা রয়েছে লিপ রিডিং (ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কি বলা হচ্ছে তা অনুধাবন) এর মাধ্যমে অন্যের কথা অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে –

কথা বলতে হবে ধীরে ধীরে ও প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। এসময় যিনি কথা বলছেন তার মুখের উপরে পর্যাপ্ত আলো থাকা প্রয়োজন যাতে কী বলা হচ্ছে শিশু তা পরিস্কার দেখতে পায়।

Tadoma: এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আঙ্গুলের স্পর্শের দ্বারা ঠোঁটের নড়াচাড়া অনুভব করে কী বলা হচ্ছে তা অনুধাবন করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা যিনি কথা বলছেন তার ঠোঁট স্পর্শ করবেন এবং হাতের অন্যান্য আঙ্গুল মুখমন্ডলের নিম্নাংশ বা চোয়াল, চিবুক, থুতনী ও কন্ঠনালী স্পর্শ করে থাকে। এর মাধ্যমে সে (শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) কী বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারে।

এ পদ্ধতি অনেকটা ট্যাকটাইল লিপ রিডিং (Lipreading) পদ্ধতির মতোই। এক্ষেত্রেও শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঠোঁটের নড়াচড়া, কন্ঠের অনুরনন বা কম্পন এবং মুখনিসৃত গরম বাতাসের মাধ্যমে বুঝতে পারে কী বলা হচ্ছে। Tadoma পদ্ধতি অনুসরণের জন্য ট্যাকটাইল, কগনেটিভ ও ফাইন মোটর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

ব্রেইল: যোগাযোগের একটি মাধ্যম হচ্ছে ব্রেইল। ব্রেইলে ফোটা বা ডটের মাধ্যমে অক্ষরগুলো বোঝানো হয়ে থাকে। এই ফোটা বা ডটের মাধ্যমে পড়া ও লেখা হয়। ব্রেইলে কোন কিছু পড়ার জন্য হাতের আঙ্গুল বা অন্য কোন অংশ দিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে পৃষ্ঠার বাম পাশ থেকে শুরু করে ডান দিকে যেতে হয়। পড়ার কাজে সাধারণত দু'হাতের নির্দিষ্ট অঙ্গুল ব্যবহার করা হয়।

মুন কোড (Moon Code): ড: উইলিয়াম মুন ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম চিত্র-শোভিত লেখার পদ্ধতি উদ্ভবন করেন। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের

জন্য প্রচলন করা হয়। প্রতিটি চিত্র বা প্রতীকই অনেকাংশেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অর্ধেক চিত্রের সাথেই ছাপার অক্ষরের মিল রয়েছে। সেকল মানুষ জীবনের কোন সময়ে তাদের দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে 'মুন কোড' পদ্ধতি তাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এই পদ্ধতি প্রচলিত রোমান হরফকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এতে মোট ১৪ টি অক্ষর বা চিত্র বা প্রতীক রয়েছে। প্রতিটি অক্ষর বা চিত্র বা প্রতীক স্পষ্টভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন কোন থেকে উপস্থাপিত হয়।

শারীরিক অভিব্যাক্তি (Gestures): শারীরিক অভিব্যক্তি একটি অভাষিক যোগাযোগ মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে আমরা যতটা কার্যকরভাবে যোগাযোগ করে থাকি অভিব্যক্তি এবং শারীরিক ভাষার মাধ্যমে ঠিক ততটাই কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। কখনও কখনও এটি ভাষার চেয়েও বেশী কার্যকর হয়ে উঠে। অভিব্যক্তি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিরাজ করে। শরীরি অভিব্যক্তির মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য দুঃসাধ্য। তবে কোন কোন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কান্না, আধো আধো স্বরে কথা বলা বা ডাকার মাধ্যমে নিজের প্রতি মনোযোগ আর্কষণ করে থাকে।

প্রতীক বা সংকেত (Symbols): প্রতীক বা সংকেত হচ্ছে কোন বস্তু, বিষয় এর মাধ্যমে কোন কিছুকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। যখন কোন প্রতীক বা সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় তখন তাকে সাংকেতিক যোগাযোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কথ্য ও লিখিত ভাষা হচ্ছে বিমূর্ত সংকেত এবং কোন বস্তু হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সংকেত বা প্রতীকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নির্দেশনা (Cues): প্রত্যেক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। যা কোন কাজে অভ্যস্ত হতে শিশুকে উৎসাহিত করে। নির্দেশনা কেমন হবে তা নির্ভর

করে নির্দিষ্ট বিষয় বা কাজের উপরে। ধরা যাক, পরিচর্যাকারী শিশুর চিবুকে টোকা দিয়ে বোঝাতে পারে- এখন ব্রাশ করবার জন্য মুখ খুলতে হবে অথবা খাবার গ্রহণ করাতে হবে বা লালা যাতে না পড়ে তার জন্য মুখ বন্ধ করতে হবে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, ভিন্ন ভিন্ন কাজের সময় আলাদা আলাদা স্পর্শ নির্দেশনা ব্যবহার করতে হবে। একাধিক কাজের জন্য একই নির্দেশনা ব্যবহার না করাই উত্তম। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো হতে পারে স্পর্শ, চলাচল বা প্রাসঙ্গিক এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু। এসম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে পরবর্তীতে আলোচনা করবো। অঙ্গভঙ্গি ও নিদের্শনার মাধ্যম শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে কী বলা হচ্ছে তা তাকে জানানো বা বোঝানো যায়।

কিভাবে যোগাযোগ গড়ে উঠে?

শিশু জন্ম থেকেই নিজের অভিব্যক্তি, চাহিদা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন উপাদান ও অন্যান্য তথ্যগত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। যোগাযোগের দক্ষতা মানুষের সহজাত বিষয়। শিশু জন্মের পর থেকেই মা বা তার পরিচর্যাকারীর সাথে বিভিন্ন উপায়ে মিথস্ক্রিয়া করে। শিশু কাঁদলে মা তাকে কোলে নেয়, আদর করে, তার প্রতি মনোযোগী হয়। শিশু কোন কারণে অস্বস্তিবোধ করলে মা তাকে অসুবিধা বা সমস্যা দুর করতে সচেষ্ট হয়, তারদিকে তাকিয়ে হাসে, কথা বলে। এর মধ্য দিয়ে মা-শিশুর বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠে। শিশু তার মতো করে বিভিন্ন কাজে সাড়া দেয়। আর এসবের মাধ্যমে তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়।

শিশু বিভিন্ন পন্থায় মা, পরিবারের সদস্য বা অন্যান্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে থাকে। এই পন্থা হতে পারে-

- মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে;
- কাঁদা, আধো আধো স্বরে কথা বলা, ডাকা ইত্যাদির মাধ্যমে;
- কন্ঠস্বর পরিবর্তনের মাধ্যমে;
- শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া বা শরীরি অভিব্যক্তির পরিবর্তন;
- অন্যকে ছোঁয়া বা ধাক্কা মারা;
- নড়াচড়ার মাধ্যমে;
- কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ/তাকানো;
- স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি;
- মারমূখী হয়ে উঠে (মারা, খোচানো, কোন কিছু ছুড়ে মারা ইত্যাদি)।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তার ইচ্ছামতো চলাচল করতে বা ঘুরে বেড়াতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এক্ষেত্রে তার নিরাপত্তার বিষয়টিও সামনে চলে আসে। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানুষ, বিভিন্ন বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সুযোগ

ও উদ্দিপনার অভাব পরিরক্ষিত হয়। এসকল শিশু তার পরিপার্শ্ব থেকে যে তথ্য পেয়ে থাকে তা সবসময় পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ন হয় না। যা অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় বাধা তৈরি করে থাকে। তাই দেখা যায় শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সমাজ, পরিপার্শ্ব, পরিবেশ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াবার জন্য যে সামান্য সুযোগ পেয়ে থাকে তাও তাদেরকে চ্যালেঞ্জ এর মুখে ফেলে দেয়।

প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। শিশু জন্মগ্রহণের পরে তার চাহিদা জানানোর জন্য, অন্যদের সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবন্ধ

হবার জন্য, নিরাপত্তার জন্য এটি করে থাকে। আমরা যদি শিশুর সাথে কোন ধরনের মিথস্ক্রিয়া না করি বা তার চাহিদা পূরণ না করি তবে অন্যের সাথে শিশুর যোগাযোগের সুযোগ কমে যাবে। মা-বাবা বা পরিচর্যাকারী বা এসকল শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে শিশু যেন নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাজ করে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করতে পারে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে মা-বাবা বা পরিচর্যাকারীর সাথে আলাপ করবে, জানাবে।

এবার আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করবো শিশুর যোগাযোগের দক্ষতা কিভাবে বিকশিত হয়-

সীমা ঘুম থেকে উঠেছে। তার গায়ে ঘুমের পোষাক। সে যে ঘুম থেকে উঠেছে বিষয়টি তার মাকে জানাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে তার মায়ের পায়ের শব্দ পায় এবং তাকিয়ে দেখে তার মা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে আসছে। সীমার মা ঝুকে তাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে যায়। বিষয়গুলো এভাবেই ঘটবে এটি সীমা জানে। কেননা ঘটনাগুলো প্রতিদিন এভাবেই ঘটছে। সে এটাও জানে বাথরুমে যেয়ে তাকে কী করতে হবে। সীমা দেখে তার মা সেলফে রাখা একটি ব্যাগ থেকে পরিস্কার কাপড় বের করছে। সীমা তার মাকে তার পরিধেয় পাল্টাতে সহায়তা করে। সে লক্ষ্য করে তার রাতের পোষাক খুলে মা একটি বড় গামলার মধ্যে রেখে তা ঢেকে দেয়। হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে সীমা নিজের মতো করে খেলাধূলা করতে থাকে। সীমার মা হাত-মুখ ধোয়াবার সময় তার সাথে খেলা করে, চিবুকে হালকা করে টোকা মারে যাতে করে শব্দ হয়, এক একটি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা বলতে থাকে। সীমা তার মায়ের সাথে এই কাজগুলো করে মজা পায়।

উপরের ঘটনাটিতে দেখা যাচ্ছে সীমা তার প্রাত্যহিক কাজগুলো কিভাবে করবে, সেটি মা তাকে শেখাচ্ছে। একই সাথে সে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ করছে। যেমন প্রবেশ করা, বের হওয়া, কোন কিছু খোলা ও বন্ধ করা, কোন কিছুর আকার-আকৃতি, আবাসস্থলের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

এখন আমরা বলতে পারি কিভাবে ধীরে ধীরে যোগাযোগ বিকাশ লাভ করে বা শিশু যোগাযোগ করতে শেখে। এখানে যোগাযোগের ধারাক্রম দেখানো হলো -

শারীরিক খেলাধুলা, কখন কোন কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা, স্বেচ্ছায় যোগাযোগ, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, পারস্পরিক আদান প্রদান, আবারো প্রক্রিয়ার শুরু, যদি কোন সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা থাকে তা নিয়ে কাজ করা।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে পারস্পরিক যোগাযোগ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, শিখন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। এসকল শিশুর সাথে কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা অনুধাবনে ও সে অনুযায়ী কাজ করবার জন্য সময় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের যেহেতু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তথ্য আদান-প্রদানে বিভিন্ন সমস্যা কাজ করে, সেহেতু সে সহজভাবে কোন কিছু গ্রহণ করে না। ফলে তাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্থ করে তোলা একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার সাথে সাথে ব্যক্তির যদি অন্যকোন প্রতিবন্ধিতা থাকে তবে এই প্রক্রিয়া আরো জটিল হয়ে পড়ে।

এখানে কার্যকর পারস্পরিক যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো:

- পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চোখে চোখে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারে না।
- শারীরিক অভিব্যক্তি মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্য, বার্তা আরো অর্থবহ হয়ে উঠে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ তার দৃষ্টি শক্তির সমস্যার কারণে এটি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ কোন ঘটনার পরম্পরা অনুধাবনে এবং যথাযথভাবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সাড়া প্রদানে ব্যর্থ হয়।
- কন্ঠস্বর উঠা-নামার মাধ্যমে আমরা একই কথা বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ করি। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কন্ঠের এই উঠা-নামা অনুধাবন করতে পারে না।

পারস্পরিক যোগাযোগের মৌলিক ধারণা:

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের পারস্পরিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবার ক্ষেত্রে আমাদের যোগাযোগের কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

প্রাক উদ্দেশ্যমূলক - উদ্দেশ্যমূলক পারস্পরিক যোগাযোগ :

প্রাক উদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ হচ্ছে শিশু যখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন কথা বা কাজ করে এবং এটি তার পরিপার্শ্বের উপরে প্রভাব ফেলে। যেমন -

- স্বাভাবিক চলাচল/নড়াচড়া: শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া
- বাহু, হাত ও পায়ের নড়াচড়া
- মুখের অভিব্যক্তি

উদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ হচ্ছে শিশু যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন তথ্য বা বার্তা প্রদানের জন্য কোন কথা বলে বা কাজ করে। এ ধরনের যোগাযোগ কোন কিছু চাওয়া বা কোন কাজ কারবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন –

- কোন কিছু ধরা বা ছোঁয়ার মাধ্যমে কোন কিছু পেতে চাওয়া
- কোন কিছু ঠেলে সরিয়ে দেওয়া, বাড়িয়ে দেয়া, দেখানো, চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরার মধ্য দিয়ে শিশু তার চাহিদা, অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

প্রাক প্রতীকি-প্রতীকি যোগাযোগ:

প্রাক প্রতীকি যোগাযোগ হচ্ছে প্রতীকি যোগাযোগের প্রাথমিক রূপ। একে প্রাক ভাষীক যোগাযোগও বলা হয়ে থাকে। শিশু এই প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ করে থাকে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে যিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এবং যে বিষয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে

তার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকবে। যেমন শিশু কেমন বোধ করছে সেটা তার জোরে জোরে কাদা, শব্দ করা, অস্থিরতা, হাসি ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এগুলোই প্রাক প্রতীকি যোগাযোগের উদাহরণ।

যখন বিমূর্ত (ভাষা) ও সুনির্দিষ্ট প্রতীকের মাধ্যমে এবং এগুলোকে ব্যবহার করে যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়, তাকে প্রতীকি যোগাযোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোন বস্তু, ছবি, ইশারা বা শব্দের মাধ্যমে আমরা কোন ধারণাকে প্রকাশ করি। প্রতীকি যোগাযোগে অভ্যস্থ হওয়া শিশুর আন্তঃযোগাযোগ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। এর মাধ্যমে শিশু কোন কিছু চাওয়া বা বিমূর্ত (বাস্তব নয়, কিন্তু তার ধারণা বিদ্যমান) কোন বিষয় ধারণা লাভ করে।

গ্রহণমূলক- অভিব্যাক্তিমূলক যোগাযোগ:

গ্রহণমূলক যোগাযোগ হচ্ছে কোন তথ্য বা বার্তা যথাযথভাবে গ্রহণ ও অনুধাবন করবার প্রক্রিয়া বা উপায়। তবে একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কিভাবে তথ্য বা বার্তা গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী সাড়া দেয় সেটা সুনিদিষ্টভাবে নিরুপণ করা কঠিন। আমরা এ অধ্যায়ের পরের অংশে একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কিভাবে বিভিন্ন নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও বার্তা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

একজন ব্যক্তি যখন কোন কিছু করার বা জানাবার উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তিকে বার্তা বা তথ্য প্রেরণ করে তাকে অভিব্যক্তিমূলক যোগাযোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ তার অনুভূতি, আকাঙ্খা, চাহিদা প্রকাশের জন্য প্রতীক, ইশারা বা অন্য কোন উপায় বেছে নেয়, যার বেশকিছু বিষয় আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে দেখেছি।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ:

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে তোলা একটি দূরুহ ও কঠিন কাজ। একই সাথে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য এটা অনুধাবন করাও কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই প্রতিটি শিশুর জন্য তার পরিপার্শ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন হয় স্বত্যন্ত্র যোগাযোগ প্রক্রিয়ার। প্রত্যেক শিশু যাতে তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে মিথস্ক্রিয়া ও যোগাযোগ করতে পারে তার জন্য আমাদের যোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুষ্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এ অংশে আমরা আলোচনা করবো

কিভাবে বিভিন্ন প্রতীক ও নির্দেশনা ব্যবহার করে গ্রহণমূলক ও অভিব্যক্তিমূলক যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়।

গ্রহণমূলক যোগাযোগ : একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু কিভাবে কোন তথ্য বা বার্তা গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তা আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। যে সকল শিশুর শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও অন্য কোন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তার জন্য বিষয়টি আরো জটিল ও দুঃসাধ্য। শিশুর গ্রহণমূলক যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, প্রত্যাশিত সাড়া পাবার জন্য শিশুকে নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সহায়ক নির্দেশনা বিদ্যমান।

স্পর্শের মাধ্যমে নির্দেশনা: শিশু যে কাজ করবে সে জন্য শরীরের যে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ বা অংশ ব্যবহার করবে তা স্পর্শের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে, যেমন- দুধ পানের জন্য ঠোঁট স্পর্শ করা বা ময়লা পোষাক পরিবর্তনের জন্য কোমর স্পর্শ করা যেতে পারে।

চলাচল বা নড়াচড়ার মাধ্যমে নির্দেশনা: নির্দিষ্ট কোন নড়াচড়ার মাধ্যমে কোন কাজ করার নির্দেশনা প্রদান। যেমন- খাবার গ্রহনের জন্য মুখের কাছে হাত নেওয়া বা ড্রাম বাজানোর জন্য হাত উপরে নিচে করা।

প্রাসঙ্গিক নিদের্শনা: কোন বিশেষ কাজ বা পরিস্থির মাধ্যমে শিশুকে কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা কাজের সাথে পরিচিত করানো। যেমন খাবারের ঘ্রাণের মাধ্যমে খাবারের সময় বা বাগানের ঘাসের মাধ্যমে তা খেলার সময়কে নির্দেশ করা।

যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একই সাথে কোন কাজ করা উচিত, কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করবার ক্ষেত্রে নির্দেশনা সহায়তা করে থাকে। তাই বলা যায় শিশুর যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা বিশেষভাবে সহায়ক। আর এ বিষয়টি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার শুরুতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিশুকে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো–

- শিশুকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হোক না কেন সেটা সব সময় একই প্রক্রিয়ায় প্রদান করতে হবে।
- যে কাজ করা হচ্ছে নির্দেশনা অবশ্যই তার সাথ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- প্রতিটি শিশুই আলাদা। ফলে একই কাজের জন্য নির্দেশনাও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

যখন শিশু স্পর্শ, নড়াচড়া বা চলাচল এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে তখন সে যোগাযোগ সম্পর্কিত শিখনের একটি পর্যায় অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে শিশুর শিক্ষক বা পরিচর্যাকারী গ্রহণমূলক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপে যেতে পারে। এই ধাপে কোন বস্তুর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। মূলত শিশু তার প্রাত্যহিক কাজে যেসকল বস্তু বা সামগ্রী ব্যবহার করে তার মাধ্যমে কাজের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। বস্তুর মাধ্যমে নির্দেশনা অনেক ধরনের হয়। এই নির্দেশনার মাধ্যমে শিশু কোন কাজ ধারাবাহিক ভাবে সম্পন্ন করবার সামর্থ অর্জন করে।

বস্তুর কোন অংশের মাধ্যমে নির্দেশনা: নির্দিষ্ট কোন কিছুকে বোঝানোর ক্ষেত্রে তার কোন অংশের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যেমন – ট্রাইসাইকেলের হাতলের মাধ্যমে পুরো ট্রাইসাইকেলকে বোঝানো হয়।

সম্পর্কিত বস্তুর মাধ্যমে নির্দেশনা: এটি আরেক ধরনের নির্দেশনা। এই নির্দেশনা কাজের সাথে সম্পর্কিত থাকে। তবে এর মাধ্যমে সরাসরি ঐ কাজকে নির্দেশ করে না। যেমন- ক্যাফেটেরিয়ায় দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য খাবারের টোকেন দেওয়ার মাধ্যমে খাবার গ্রহণ করবার সময়কে বোঝানো হয়ে থাকে।

Arbitary object cues: এই ধরনের নির্দেশনা সরাসরি ঐ কাজের সাথে যুক্ত নয়। তবে এর মাধ্যমে কাজের অবস্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে। ধরা যাক - শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিদিন স্কুলের টয়লেট ব্যবহার করে থাকে। টয়লেটের সামনে একটি ঘূর্ণয়মান দরজা রয়েছে। এখন শিক্ষার্থীবৃন্দকে অনুরূপ একটি ঘূর্ণয়মান দরজার মাধ্যমে টয়লেটকে বোঝানো হল। ফলে শিশুরা যখন টয়লেটে যাবে তখন অনুরূপ দরজা দেখে তারা টয়লেটকে সনাক্ত করবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, যে কোন কাজকে নির্দেশের জন্য কোন বস্তুকে বা বাস্তব প্রতীককে ব্যবহার করতে হবে এমন নয়। তবে অবশ্যই সঠিক বস্তুর মাধ্যেমে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। আমরা যদি শিশুকে কোন বস্তুর মাধ্যমে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করে যোগাযোগ করতে চাই তবে বিষয়কে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে-

শিশুকে বস্তুর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে এমন বস্তু বাছাই করা উচিত যার সাথে শিশু পরিচিত। যেমন-
গোসল করবার সময় হলে তাকে তোয়ালা বা সাবান দিতে হবে।

- এমন কোন বস্তু নির্দেশক হিসেবে নির্বাচন করা প্রয়োজন যা শিশু ঐ কাজে ব্যবহার করে।

- তার দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বস্তুর মাধ্যমে তার নির্দেশনার কাজ শুরু করা উচিত।
- কোন একটি বস্তু দ্বারা শিশু কোন একটি নির্দেশনার মাধ্যমে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, ঐ বস্তুর মাধ্যমে শিশুকে অন্য কোন নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

যখন নির্দেশনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে তখন তার শিক্ষক বা পরিচর্যাকারী শিশুকে কীভাবে নিজের চাহিদা,প্রয়োজন, অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হয় তার শেখানোর দিকে অগ্রসর হবে। এর জন্য এমন বস্তুকে বাছাই করতে হবে যা সহজই স্পর্শ করা যায়। অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা রয়েছে বা শুধুই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ছবি) রয়েছে এমন বস্তুকে নির্বাচন করা প্রয়োজন। যে কাজ বা ঘটনাকে নির্দেশ করবার জন্য এই বস্তু ব্যবহার করা হবে তার সাথে এর সরাসরি যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। এসকল বস্তুর ব্যবহার এমন ভাবে করতে হবে যাতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একে সহজেই সনাক্ত (হাতে নিতে পারা বা স্পর্শ করতে পারা) করতে পারে।

বাস্তব প্রতীক বা স্পর্শযোগ্য প্রতীক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে-

- যে কোন বস্তু
- কোন বস্তুর কোন নির্দিষ্ট অংশ যা পুরো বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে
- মনে রাখার মতো কিছু
- ছবি (ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে)।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ যাতে বাস্তব প্রতীক বা বস্তুর মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ, প্রাত্যহিক কর্মাদী সম্পন্ন করবার দক্ষতা অর্জন করে তার জন্য বিবিধ পন্থা রয়েছে। আর এর জন্য কিছু বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শ্রবণদৃষ্টি

প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষত যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তাদের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বা মডেলের মাধ্যমে কোন নির্দেশনা প্রদান পরিহার করতে হবে।

- যদি শিশু সকল প্রতীকের অর্থই অনুধাবন করতে পারে তবে বিষয়টি ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে
- শিশু কতটুকু শিখবে বা তার দক্ষতার তথ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন
- শিশুর শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করা
- শিশুকে যে সকল প্রতীকের সাথে পরিচিত করানো হচ্ছে তার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে
- বিভিন্ন কাজে প্রতীকগুলো ব্যবহার করতে হবে
- বিভিন্ন কাজে প্রতীকগুলো ব্যবহার করতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে
- প্রতীক বা বস্তু বহনযোগ্য হতে হবে। তাহলে শিশু এগুলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারবে
- যখন প্রয়োজন হবে তখন শিশুকে নতুন কিছুর সাথে পরিচিত করাতে বা শেখাতে নতুন প্রতীক বা বস্তু ব্যবহার করতে হবে।

Communicative Environment:

যখন আমরা Communicative Environment এর কথা বলি তখন বুঝিয়ে থাকি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে আমরা কোন মাত্রায় ও কত নিয়মিত যোগাযোগ করছি সে বিষয়টিকে। যদি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়মিত, পর্যাপ্ত ও যথাযথ তথ্য বা বার্তা দেওয়া হয় তবে সেও একই ভাবে সাড়া দেবে। অন্য সকল শিশুর মতো শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরও কোন ঘটনা বা পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্যের প্রয়োজন হয়। শিশুর কাছে তথ্যের ঘাটতি থাকলে বা

বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলে পরিস্থিতি অনুযায়ী সে সাড়া দিতে ব্যর্থ হবে। সে বুঝে উঠতে পারবে না কিভাবে সে এতে অংশগ্রহণ করবে।

একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তার পরিপার্শ্বের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। ফলে সে অনেক তথ্য পাওয়া থেকেই বঞ্চিত হয়। এসকল তথ্য পরিবেশের সাথে প্রাত্যহিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে উৎসরিত হয়। তাই আমরা যদি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতার উপরে ভিত্তি করে তার যোগাযোগের ধারণা তৈরির প্রয়াস নেওয়া হয় তবে তা অনেক বেশী ফলপ্রসু হবে। এক্ষেত্রে শিশুর সাথে যিনিই যোগাযোগ করুক না কেন একই নিয়মে, একই ভাবে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যেমন- মনিকাকে বসতে বলার ক্ষেত্রে তার কাঁধ স্পর্শ করা এবং কোথায় বসবে সেটা বোঝাতে তার হাত দিয়ে স্পর্শ করানো হয়। মনিকার মা-বাবা একই ভাবে তাকে বসার জন্য এই নির্দেশনা প্রদান করে। ফলে মনিকা যখন শ্রেনী কক্ষে খাবার গ্রহণ করে এই নির্দেশনার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে কোথায় বসে সে খাবার গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে তার শিক্ষক, সহপাঠি বা স্কুলের কেউ এই নির্দেশনা দেয়। এই ধারাবাহিক নির্দেশনা মনিকাকে বুঝতে সহায়তা করে কখন কি করতে হবে এবং মানিকা সেভাবেই বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

এখন যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে তা আমাদেরকে Communicative Environment এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। এটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায্যে করে।

শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও দ্রুত সাড়া প্রদান করা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু যখন কারো সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তখন ইতিবাচকভাবে দ্রুত সাড়া প্রদান করা বাঞ্চনীয়।

পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া: যেসকল পরিবেশে বিস্তারিত নির্দেশনার মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর আচরণে সাড়া দেওয়া আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশু কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করবে তা নির্ধারণ করে না, তবে তাকে মিথস্ক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ও তার সাথে যিনি মিথস্ক্রিয়ায় করেন বা তার পরিচর্যাকারী উভয়কেই নিজেরদের অনুভূতি একে অন্যকে জানাতে হয়। তারা যদি এই মিথস্ক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ না করে তবে পারস্পরিক যোগাযোগ ফলপ্রসু হবে না।

শিশুর পছন্দের প্রতি গুরুত্ব প্রদান: যখন এবং যেখানে সম্ভব হবে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে তার পছন্দ মতো কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে।

ইন্দ্রিয়গত সমস্যাকে অন্যভাবে পূরণ: প্রতিটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই আলাদা ও অনন্য। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর এই ইন্দ্রিয়গত চাহিদা কোন না কোন ভাবে পূরণ করে থাকে।

সুযোগকে কাজে লাগানো: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর শিখন শুরু হয় তার বাড়ীতে, স্কুলে। এ পরিবেশে শিশু যা শিখে থাকে তা অন্য পরিবেশে ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। তাই শিশুকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও মানুষের সাথে একই ধরনের পারস্পারিক যোগাযোগের সুযোগ তৈরী করে দেয়া আবশ্যক।

যোগাযোগের বিভিন্ন কারণ: শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেখানে শিশুর পারস্পারিক যোগাযোগের জন্য নানাবিধ কারণ বিদ্যমান থাকবে। একই সাথে এই পরিবেশে শিশু অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

যোগাযোগের অবস্থা নিরূপণ: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগের অবস্থা বা মাত্রা নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন শিশুকে তার পরিপার্শ্বের সাথে, পরিবার-বন্ধুদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে শেখাই, সেক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগ দক্ষতা ও সক্ষমতা পরিমাণ করা প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ধরন বা রূপ রয়েছে। আমাদেরকে যোগাযোগের জন্য এমন পন্থা বাছাই করতে হবে যাতে শিশু সহজেই যোগাযোগে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু সহজেই তথ্য বা বার্তা গ্রহণ ও নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে, কোন কিছুকে নির্দেশ করতে পারবে, পরিপার্শ্বে চলাচল করতে সক্ষম হবে ও বাধা সনাক্ত করতে পারবে, ইশারা অনুধাবন করবার মতো অনেক কিছুই করতে পারবে।

শিশু কোন বার্তা গ্রহণ ও প্রতিবার্তা প্রদানের জন্য কি করে? যোগাযোগের এসকল মাধ্যম সে কীভাবে ব্যবহার করে? শিশু বাবা-মা, শিক্ষক ও বন্ধুর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে? এসকল ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান, কোন কিছু বলা, চলাচলের সময় প্রয়োজনে থামা ইত্যাদি মাধ্যমে করা হতে পারে।

যোগাযোগ পরিকল্পনা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা একটি দূরহ ও জটিল কাজ। কেননা প্রত্যেক মানুষ যোগাযোগের জন্য তার পছন্দসই এবং ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ব্যবহার করে থাকে। আবার প্রত্যেক যোগাযোগ প্রক্রিয়াই কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিষয়, ভাবনা, পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় বা পন্থা:

যোগাযোগের উপায় বা পন্থা নির্দেশ করে শিশু কীভাবে যোগাযোগ করছে। একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বিভিন্ন উপায়ে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

- মুখের অভিব্যক্তি,
- কোন কিছু নির্দেশ করা,
- ইশারা ভাষার মাধ্যমে,
- কোন বস্তু ব্যবহার করে,
- ছবির মাধ্যমে,
- শব্দের মাধ্যমে
- কথার মাধ্যমে
- বড় বড় ছাপার মাধ্যমে
- ব্রেইল এবং আরো অনেক উপায় রয়েছে যা এই অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা জড়িয়ে ধরা বা আলিঙ্গন করার মাধ্যমে ভালোবাসা বা ভালোলাগা প্রকাশ করি। এটাও যোগাযোগের একটি মাধ্যম। অতএব আচার আচরণের মাধ্যমেও কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা কাজকে পছন্দ করা না করাকে প্রকাশ করা যায়।

যোগাযোগের কাজ:

কেন যোগাযোগ করা হয় সেটা অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে প্রথমে যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন কারণ বা উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। জন্মের পর পরই শিশু বিভিন্ন কারণে যোগাযোগ করে। যেমন–

- কোন বিষয়ে আপত্তি জানানো বা প্রত্যাখান করা,
- মনোযোগ আর্কষণ করা, নিজের চাহিদাকে প্রকাশ করা ইত্যাদি,

- যে কাজ করছে তা করে যাওয়া,
- কোন কিছুর প্রতি পছন্দ প্রকাশ করা, খেলা করা, খেলনা চাওয়া ইত্যাদি

আবার পরবর্তী জীবনে একেবারে ভিন্ন কারণে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন–

- অন্যকে কোন কিছু দেওয়া,
- কোন বিষয়ে কাউকে পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করা,
- সম্ভাষন জানানো,
- অন্যের সাথে তথ্য, বার্তা আদান প্রদান করা,
- অনুরোধ করা,
- কোন তথ্যের সন্ধান করা ইত্যাদি।

যোগাযোগের বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা: যোগাযোগের প্রাসঙ্গিকতা বলতে 'শিশু যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে বা মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়' তাকে নির্দেশ করে। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষও যুক্ত থাকে। অপর দিকে বিষয় হচ্ছে এই পরিবেশের অন্তভূক্ত বাইরের যে কোন কিছু। এটি হতে পারে কোন ব্যক্তি, বস্তু, খেলা, আবহাওয়া, যন্ত্রনা, খাদ্য সামগ্রী বা অন্য যে কোন কিছু। এগুলো শিশুর প্রত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে বিষয় হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কোন কর্মকান্ড, যেখানে শিশু অংশগ্রহণ করে, মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।

যোগাযোগের বিষয়বস্তু: আমরা যে কারণে যোগাযোগ করে থাকি তাই যোগাযোগের বিষয়বস্তু। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করি তা প্রকাশের জন্য অনেক সময় তাকে অলিঙ্গন করি বা জড়িয়ে ধরি।

আমরা যখন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো তখন এই বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিখন প্রক্রিয়া:

শিক্ষক শিশুর যোগাযোগ বা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এখানে যোগাযোগের কিছু কার্যকর উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

- পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা: অন্যান্যদের সাথে শিশুর পারস্পরিক যোগাযোগ অনেকাংশে নির্ভর করে তার পরিবারের কার্মকান্ড এবং বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার উপরে।
- কোন নির্দিষ্ট পন্থায় যোগাযোগ করতে হবে এমন কোন বিষয় নেই। শিশু যে উপায়ে যোগাযোগ করতে পছন্দ করে তার উপরে ভিত্তি করে যোগাযোগ করবে। এর মাধ্যমে সে তার পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে ও এই মধ্য দিয়ে তার যোগাযোগ দক্ষতাকে শাণিত করবে। যোগযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- শিশুর পারস্পরিক যোগাযাগ অবশ্যই বিভিন্ন মানুষের সাথে সংঘঠিত হতে হবে।
- যোগাযোগ কখনই এক পাক্ষিক হয় না। যিনি শিশুর সাথে যোগাযোগ করবেন, মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হবেন তিনি শিশুর বন্ধুর ভুমিকা পালন করবেন। শিশুকে কোন কাজের জন্য আদেশ দেবেন না, বকাঝকা করবেন না, ও আমি যা বলছি তাই করো' এমন মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে।

- যোগাযোগ যতটা সম্ভব সরাসরি করা প্রয়োজন। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সময় প্রয়োজনে দোভাষীর সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। তবে এ যোগাযোগ যদি নিয়মিত হতে থাকে তবে অন্যদেরকেও শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে কার্যকর ভাবে যোগাযোগ করবার প্রক্রিয়া শিখতে হবে। যদি কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তবে তার ব্যবহারও শিখতে হবে।
- পারস্পরিক যোগাযোগ অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে।
- পারস্পরিক যোগাযোগ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তাই যোগাযোগ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সকল ক্ষেত্রে, পর্যায়ে (পরিবেশ, সহযোগী, দক্ষতা) শিশুর মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। শিশুর জন্য যে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে তার প্রতিটি পর্যায়ে যোগাযোগের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

পারস্পরিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিকাশ:

প্রস্তুতি: যোগাযোগ শুরুর উদ্যোগ: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তার চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন স্পর্শ নির্দেশনা, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, শারীরিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এর মাধ্যমে অনুধাবনের সাথে সাথে সে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, মিথস্ক্রিয়া করে। এমন হতে পারে শিশু কোন কিছু অপছন্দ করছে , এমনকি সে কাজ যদি শিশু করে থাকে তাও। ধরা যাক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে তার কক্ষ থেকে অন্য একটি কক্ষে স্থানান্তর করা হলো। কিন্তু তাকে এর সাথে পরিচিত হবার কোন সুযোগই দেওয়া হলো না। অথবা তার সামনেই এক স্থানের বা বাক্সের জিনিস অন্য স্থানে বা বাক্সে রাখা হলো। সে এত বিভ্রান্ত হয়। বাক্সের জিনিস সম্পর্কে বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। শিশুর নিকট এ অবস্থা পছন্দ নাও হতে পারে এবং এগুলোকে সে প্রত্যাখান করে। এমনকি এই কাজগুলো যদি তার প্রাত্যহিক কাজের

অংশও হয়ে থাকে, পছন্দ করে থাকে, তবুও একাজ করতে আগ্রহ বোধ করে না। কেননা তাকে এটি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পছন্দ নির্বাচন: আমরা কখন কোন কাজ করবো এটি যেমন আমরাই ঠিক করে থাকি, তেমনি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর মনোভাব, শারীরিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ের উপরে নির্ভর করে সে কোন্ কাজটি কখন করবে। আমরা যদি শিশুর পছন্দ অনুযায়ী পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে সাজিয়ে তুলি, তবে তা শিশুর পছন্দ অনুযায়ী কাজের সুযোগ তৈরিতে সহায়ক হবে। এঅবস্থা অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে সাহায্যে করে। এবং সামগ্রীক পরিবেশ শিশুর নিয়ন্ত্রণে থাকে, শিশু পরিবেশকে নিজের মতো ব্যবহার করতে পারে। স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ শিশুকে অন্যের সাথে ঘন ঘন মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে পপারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে, পরিবেশের উপরে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পরিবেশ: যেসকল শিশুর প্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির বিভিন্ন মাত্রার ক্ষতিগ্রস্ততা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পরিবেশগত অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন প্রচুর আলো, শব্দ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এর ফলে কোন কিছু উপভোগ করা, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং কোন কিছু বোঝা ও সে অনুযায়ী সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একটি উদাহরণ দেখা যাক- সন্তোষ একজন ১২ বছর বয়সী বালক। সে উসার সিনড্রোমে আক্রান্ত। সে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া শিখছে। তার এই দক্ষতা বজায় রাখবার জন্য সে নিয়মিত ব্রেইলের মাধ্যমে লেখা ও পড়ার চর্চা করে থাকে। এই অনুশীলন বা চর্চা সে তার বন্ধু, সহপাঠিদের সাথে করে। মাঝে মধ্যে সে তার বসার জায়গা বা স্থান পরিবর্তনের জন্য শ্রেণী কক্ষের অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে অন্য সহপাঠিদের সাথে বসে। কিন্তু এখানে বসে সে তার অন্যান্য বন্ধু ও সহপাঠিদেরকে ভালোভাবে দেখতে পায়না, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। সাথে সাথে

তাকে যে কাজ দেওয়া হয় (পড়া) সেটি করতেও সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমনকি বন্ধুদের সাহায্য নিয়েও সে এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এখনও সন্তোষ এ অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। সে তার এই অবস্থার কথা শিক্ষককে জানায়। শিক্ষক তার বন্ধুদের নিকট থেকে তার এই অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষক তার বসবার জন্য প্রচুর আলো রয়েছে এমন স্থান নির্বাচন করে। এখন সে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে।

নিরাপত্তা: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিরাপত্তাহীনতা শিশুর কার্যকর অংশগ্রহণ বা মিথস্ক্রিয়াকে ব্যহত করতে পারে , বন্ধ করে দিতে পারে। ভ্রমণের সময়ে, কোন কিছুর সাথে পরিচিত হবার ক্ষেত্রে এবং চলাচলের নির্দেশনা প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। একই সাথে শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের সাথে ভালোভাবে পরিচিতির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

পরিচিতি: শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুসহ আমরা সকলেই এমন একটি পরিবেশ চাই যেখানে শিশু স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন নতুন দক্ষতা বিকাশে কাজ করবে। ধরা যাক- একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বিভিন্ন ফলমূল ও শাক-সবজীর নাম শিখেছে ও এগুলো চিনেছে। তার এই শিক্ষা বা দক্ষতাকে আরো শাণিত করবার জন্য তাকে নিয়ে একটি সবজীর দোকানে যাওয়া হলো। স্বল্প শ্রবণ ও দৃষ্টি ক্ষমতার জন্য শিশু যখন প্রথমবারের মতো সবজীর দোকানে যাবে, সে বিভ্রান্ত হতে পারে। কেননা সেখানে আলো-আধারী, বিভিন্ন ধরনের ঘ্রাণ, স্ফুরণ এর সাথে সে পরিচিত নয়। এসময় শিশুর হয়তো কিছুই মনে পড়বে না এবং এগুলোকে সনাক্ত করবার জন্য তার শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের শরণাপন্ন হবে। আমরা যদি শিশুকে এক সপ্তাহ পরে আবার ঐ সবজীর দোকানে নিয়ে যাই তাবে বিভিন্ন নির্দেশকের মাধ্যমে সে সবজীগুলো সনাক্ত করতে পারবে।